প্রবাসে বাংলা বর্ষবরণ

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বন। তার মধ্যে সর্বজনীন উৎসব হচ্ছে–বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ। আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এ উৎসব কালক্রমে নতুন মাত্রা পেয়েছে, গ্রামীণ বা লোকজ সংস্কৃতি এখন নাগরিক সংস্কৃতি তথা সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ফলে আদি উৎসবের নান্দনিকতা কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে, আবার অন্যভাবে কিছুটা নান্দনিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা অবশ্যই ভালোমন্দের বিতর্ক রয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ, বৈশাখীকে নগরায়ণ করে শহরের সাজানো রূপ-রস-রঙ দিয়ে 'ঢং' করে স্বাভাবিক স্বতস্ফুর্ততাকে নষ্ট করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, বাংলা নববর্ষ তথা পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব এবং গৌরবত্ব আরো উজ্জ্বল হয়েছে। যেন নৌকা থেকে গ্রামের গরুগাড়ি চড়ে শহরে এসেছে, শহর থেকে ট্রেনে চড়ে রাজধানীতে এসেছে। আর রাজধানী থেকে উড়োজাহাজে উড়ে প্রবাসে ছড়িয়ে পড়েছে–বৈশাখী উৎসব। তাই এখন টোকিও, টরন্টো, লন্ডন, নিউইর্য়ক, রোম, সিডনি বিশ্বের বিভিন্ন শহরগুলো মুখরিত হয়ে উঠে বাঙালিদের বৈশাখী উৎসবে। প্রবাসে কর্মব্যস্ততা এবং জীবন সংগ্রামে সবাই হাফিয়ে উঠে, বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে যখন হাবুডুবু খায়, তখন নিজস্ব শেকড়ের সন্ধানে কিছুটা আত্মতৃপ্তি খুঁজে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মদের জন্য। ছেলেমেয়েকে বলা হয়–এই তোমার আদি উৎসব, এই তোমার আত্মপরিচয়।

বিদেশে মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি প্রকাশও এক ধরণের অহংকার, গৌরব। কারণ, বিভূঁইয়ে তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম প্রজন্মরা পর্যায়ক্রমে মিশ্র-সাংস্কৃতিক স্রোতে হারিয়ে ফেলে আত্মসংস্কৃতির অস্তিত্ব। সেজন্য শুধু স্বদেশ বা মাতৃভূমির স্বার্থেই নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির স্বার্থেই প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের নিজ নিজ সংস্কৃতিকে চর্চার মাধম্যে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত আবশ্যক।

এদিক দিয়ে, আমাদের বাঙালিরা এক ধাপ এগিয়ে বলে আমার বিশ্বাস। প্রবাসীরা সারা বছরই ঘুরে ফিরে বিজয় দিবস, একুশের শহীদ দিবস, তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বৈশাখী উৎসব ইত্যাদি ছাড়াও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, ঈদ-পুজা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম-মৃত্যু দিবস, যথাযোগ্য মর্যদা এবং মহা উৎসবে পালন করছে, তুলে ধরছে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য-অহংকারকে। এ প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় ঘটনা তুলে ধরা প্রয়োজনবোধ করছি।

২০০৫-এ টোকিওতে বৈশাখী উৎসব আয়োজন করছে প্রবাসী বাঙালিরা। সেখানকার এক লেখক, সম্পাদক ও সাংস্কৃকিতকর্মী আমাকে নিমন্ত্রণ করলো। আমি প্রস্তাব করলাম, আমার চেয়ে এমন একজনকে নাও যাতে মেলাটা আকষর্ণীয় হয়। প্রথমে হুমায়ূন আহমেদ পরে ইমদাদুল হক মিলনের নাম ঠিক করলাম। মিলন আর আমি ছাড়াও আরো দু'জন সাংবাদিক মনির হায়দার ও নিশাত মুশফিকা আমরা যোগ দিলাম নিশিকুচি পার্কের বৈশাখী মেলায়। অন্য এক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন শাইখ সিরাজ, আদিত্য শাহীন প্রমুখ। খুব জমজমাট মেলা হলো দু'দিনব্যাপী। অনুষ্ঠানে টোকিও সিটির মেয়রকে তুলে ধরা হলো প্রতীকী শহীদ মিনার এবং প্রবাসীরা দাবি জানালো সেখানে একটি শহীদ মিনারের। মাননীয় মেয়র রাজি হলেন এবং দু'তিন মাস পরেই নিশিকুচি পার্কে প্রস্তাবিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি খালেদা জিয়া। সৌভাগ্যক্রমে টোকিও আন্তর্জাতিক বইমেলা অংশ নেয়ার জন্য সেই সময় আবারও আমিও টোকিওতে। দূতাবাস থেকে দাওয়াত পেলাম। গেলাম। হাতের কাছে পুষ্প নেই। তবুও আবেগে আপ্লুত হয়ে নিজের কোট থেকে ফিতাফুলের বেইজ খুলে আমিই প্রথম পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলাম।

আজ সূর্যোদয়ের দেশের রাজধানীর বুকে বাংলার শহীদ মিনার দাঁড়িয়ে আছে! যা জাপান প্রবাসী বাঙালিরা বৈশাখী মেলা থেকেই সূচনা করেছিল! কাজেই বৈশাখের সাথে বিজয় দিবস, বিজয় দিবসের সাথে রবীন্দ্র-নজরুল পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। যে সম্পৃক্ততায় বাংলা সংস্কৃতি সমৃদ্ধ এবং সম্প্রসারিত। সেই সম্প্রসারণের জয় ও জোয়ার দেখা পাই, তেরো হাজার মাইল দূরে সুদূর কানাডায়। বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ সাধারণত ১৫ এপ্রিল পড়ে। আর এর কাছাকাছি শনি-রবি ছুটির দিন বিভিন্ন সংগঠনগুলো ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়। বাংলা পাড়াগুলো জমে উঠে নানান আয়োজনে। অথচ এক যুগ বা এক দশক আগেও এতো ব্যাপক হারে বৈশাখী উৎসব পালিত হতো না। ঘরোয়াভাবে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এক সময় সীমাবদ্ধ ছিলো। পান্তা ইলিশের মধ্যে আর এখন ৫ ডলার ১০ ডলার টিকিট কেটে প্রবাসীরা অনুষ্ঠান উপভোগ করে। যা রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বিষয় যুক্ত হয়েছে। আবার কিছুটা দল-কোন্দল ও সৃষ্টি হয়েছে।

বিগত ৩/৪ বছর ধরে দেখছি, প্রচন্ড শীত ও তুষার পাত শেষ হয়ে অপরূপ সবুজে ছেয়ে যায় পৃথিবীর অন্যতম সেরা শহর টরন্টো। আর টরন্টোবাসীও গা ঝারা দিয়ে জেগে উঠে শীতনিদ্রা থেকে। ফলে বৈশাখী উৎসব প্রাণ পায় ভিন্ন মাত্রায়। ঢাকার রমনার উৎসবের মতো না হলেও প্রবাসী বাঙালিরা সেজেগুজে বিশেষ করে নারীদের শাড়ি পরা মনে করিয়ে দেয় কুমার বিশ্বজিৎ-এর গানের কলি : ‘এক দিন বাঙালি ছিলাম রেঃ’

গত ক’বছর ধরে লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশ থেকে খ্যাতিমান শিল্পীরা আসছেন। যেমন–রুনা লায়লা, আলমগীর, বেবী নাজনীন, শুভ্র দেব, এন্ড্রো কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ, কনক চাপা, তারিন, হায়দার হোসেন, শাহনাজ বেবী, মিলারা এসে উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোকে জীবন্ত করে। ক্ষণিকের জন্য হলেও গানে গানে মনে হয়–মিনি বাংলাদেশ।

লেখক পরিচিতি ঃ কবি, টরেন্টোতে বসবাসরত।